ইউনিট ১০

কোম্পানি শাসনামল ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন (১৭৭২-১৮৫৮ খ্রি.)

ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে দিউয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোম্পানি শাসনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃত রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। এরপর একদিকে যেমন ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা দিন দিন ক্রমেই বাড়তে থাকে, তারা ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে নানা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ সংগ্রামও বাড়তে থাকে। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যাবহিত পরেই এর বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন পরিচালিত হয়। বাংলার জনজীবনে ইসলামের মৌল অনুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানির দোসর জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য যুগপৎভাবে ফরায়েজি আন্দোলন ও তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন পরিচালিত হয়। তবে এসব আন্দোলন ছিল স্থানীয় ও আকস্মিক। কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিচালিত আন্দোলন হলো ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রাম। এটিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও এ সংগ্রাম সফল হয়নি। তথাপিও এর মাধ্যমে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)
- ➔ পাঠ ২ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)
- ➔ পাঠ ৩ : ফরায়েজি আন্দোলন
- ➔ পাঠ ৪ : তিতুমীরের আন্দোলন
- ➔ পাঠ ৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানি শাসনের অবসান

পাঠ-১ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কেননা এর মাধ্যমে বঙ্গ-ভারতে ব্রিটিশদের প্রকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়।

১.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। তাই এদেশ থেকে মুনাফা লুণ্ঠন এবং পুঁজি সংগ্রহ করা ছিল কোম্পানির মূল লক্ষ্য। ভারতের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমি এবং অর্থনীতি ছিল ভূমি কেন্দ্রিক। এমতাবস্থায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন সংগঠিত করা। নানা কারণে কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন (১৭৬৫-৭২) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এসময় এদেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমতাবস্থায় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে কোম্পানির গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান এবং বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জমিদারদের সাথে 'পাঁচসালা ভূমি বন্দোবস্ত' করেন। তবে নানা কারণে এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হলে তিনি ১৭৭৭ সালে 'একসালা বন্দোবস্ত' করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হওয়ায় ১৭৮৪ সালের ভারত শাসন আইনে কলকাতার কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সরকারি বিশেষজ্ঞ মহলে মতানৈক্য থাকায় কর্নওয়ালিশ তাৎক্ষণিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারেন নি। ১৭৯০ সালে তিনি 'দশসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। তিনি কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স) অনুমতি পাওয়া গেলে এ ব্যবস্থাকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করার আশ্বাস দেন। অবশেষে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর চূড়ান্ত অনুমোদন ক্রমে কর্নওয়াশি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ 'দশসালা বন্দোবস্ত'কে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে ঘোষণা করেন।

১.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রর্বতনের কারণ বা উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কিছু আশু কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল। যথা- (ক) সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প খরচে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। (খ) জমির উপর জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান। কেননা এর ফলে স্বাভাবিকভাবে জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। আবাদি জমির সংখ্যা বাড়বে। একই সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। (গ) এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা- যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজ অনুগত থাকবে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক ভিত্তি হবে।

১.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল কোম্পানি, সরকার ও জমিদারদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে জমির একমাত্র মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২. জমিদারদের স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর, দান বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষমতা দেওয়া হয়।
৩. রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।
৪. কোন অজুহাতে রাজস্ব বাকি রাখা যাবে না। জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে পরিশোধ না করতে পারলে, জমি নিলাম করে রাজস্ব আদায় করা হবে। এই নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত।
৫. এই ব্যবস্থায় কৃষককে জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত করা হয় এবং
৬. ভূমি নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ হিসাব রাখার জন্য রাজস্ব ভূমির একটি 'পাঁচসালা' রেজিস্ট্রার রাখার বিধান করা হয়।

১.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল

বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণ এর ফলাফলকে সুফল ও কুফল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

ক. সুফল

প্রথমত, জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করায় জমিদারগণ জমির উন্নয়নে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এতে জমির উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হয়।

দ্বিতীয়ত, জমি থেকে সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়। ফলে কোম্পানির বাজেট প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সুবিধা হয়।

তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় ইংরেজ অনুগত একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণী এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থত, নবসৃষ্ট বিত্তবান জমিদারদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে গতিশীলতা আসে। এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রাম-বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়।

খ. কুফল

প্রথমত, কোন জরিপের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়ায় অনেক জমিদারিতে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করা হয়। ফলে অনেক জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে 'সূর্যাস্ত আইনে' জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। তখন এগুলো ক্রয় করে নেয় পুঁজিপতি, বেনিয়া মুৎসুদ্দী মহাজন শ্রেণী।

দ্বিতীয়ত, নতুন জমিদারদের অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ। এরা ছিলেন শহরবাসী। ভূমির সাথে এদের সংযোগ না থাকায় ভূমিতে মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মুনাফা লোভী এ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী কৃষকদের নানা রকম নিপীড়ন ও নির্যাতন করতেন।

তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় কৃষক ভূমিতে তার মালিকানা হারায়। তারা জমিদারদের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত হয়। বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদাররা কৃষকদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়।

চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ বন্ধ করে দেয়। কেননা অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় পুঁজিপতি শ্রেণী ভূমিতে মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। অতিরিক্ত করারোপ এবং সরকারের নিরুৎসাহিত করার ফলে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস পায়। ফলে শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

১.৫ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুসলমান সম্প্রদায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিনষ্ট হয়। মুসলিম আভিজাত্যের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। কেননা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসন হতে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু মুসলিম আমলে রাজস্ব প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো ছিল মুসলমান অভিজাতদের একচেটিয়া দখলে। নতুন ব্যবস্থায় মুসলিম অভিজাতগণ ভূমির সাথে তাদের সাবেক সম্বন্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফলে তারা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সার-সংক্ষেপ

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' এবং 'একসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ দুটি বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়নি। এমতাবস্থায় গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৭৯৩ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন- যা ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এটি ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী বিধিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সফলতা লাভ করলেও এ ব্যবস্থার ফলে সাধারণ কৃষক এমনকি অনেক সম্ভ্রান্ত বনেদি জমিদার সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নগদ টাকার মালিক ও পুঁজিপতি মহাজনরা রাতারাতি জমিদারে পরিণত হয়। নব সৃষ্ট এ জমিদার শ্রেণী ইংরেজ শাসনের জন্য একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সালে এ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন—
   ক. লর্ড ক্লাইভ
   খ. ওয়ারেন হেস্টিংস
   গ. লর্ড কর্নওয়ালিশ
   ঘ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক

২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়-
   ক. ১৭৮৯ সালে
   খ. ১৭৯০ সালে
   গ. ১৭৯১ সালে
   ঘ. ১৭৯৩ সালে

৩. বাংলায় ইংরেজ অনুগত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়-
   ক. দ্বৈত শাসনের ফলে
   খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে
   গ. পাঁচসালা বন্দোবস্তের ফলে
   ঘ. একসালা বন্দোবস্তের ফলে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ________________ পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে।

২. ১৭৯৩ সালে ______________ বন্দোবস্তকে ____________ বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দেওয়া হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কোন গভর্নর জেনারেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন?

২. নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোন আইনের মাধ্যমে জমিদারি নিলাম করা হতো?

ঙ. সংক্ষিপ্ত -উত্তর প্রশ্ন

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ফকির-সন্ন্যাসীদের পরিচয় এবং তাদের বিদ্রোহের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণতি আলোচনা করতে পারবেন।

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমে বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সনাতন অধিকার ও সুবিধা বিনষ্ট করে। ফলে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বাংলায় স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) ছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

২.১ ফকির-সন্ন্যাসীদের পরিচয়

ফকির-সন্ন্যাসীরা বাংলারই অধিবাসী। এরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষ একটি দল। এদের অধিকাংশই ছিল অবিবাহিত এবং সংসারত্যাগী। তাদের অনেকেই বিবস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতেন। এরা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সুযোগমত বিভিন্ন স্থানে আস্তানা গড়ে তুলতেন। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়। ফকিররা ছিলেন মাদারিয়া সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বেদান্তের মায়াবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাদের অনেকেরই আধ্যাত্মিক জগৎ হতে বিচ্যুতি ঘটে। তারা পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

২.২ বিদ্রোহের কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ফকির-সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করে। এর কারণ—

ক. কোম্পানি সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। এতে তাদের তীর্থস্থান ভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠানে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

খ. ফকির-সন্ন্যাসীরা গ্রামবাসীদের কাছ হতে ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। সরকার এই ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং

গ. সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের ডাকাত-দস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করে জমিদারদের সাহায্যে তাদের দমনের চেষ্টা করেণ। এমতাবস্থায় নিজেদের স্বার্থের বিরোধী কোম্পানি সরকারকে উৎখাত করার জন্য ফকির-সন্ন্যাসীরা সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়।

২.৩ ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ

ফকির মজনু শাহ বুরহানা ছিলেন ফকির আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও নেতা। অন্যদিকে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। এদের নেতৃত্ব ১৭৬০ সালে বর্ধমান হতে এ সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং ১৮০০ সালের মধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তবে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের তীব্রতা ছিল উত্তর বঙ্গে। ১৭৭১ সালে ফকির মজনুশাহ সমগ্র উত্তর বঙ্গে বড় রকম ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি, নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ি, কোম্পানির সহযোগী দেশীয় বণিকদের নৌকা, কোম্পানির রসদ সরবরাহকারী যানবাহন ইত্যাদি। এসব আক্রমণে তারা বর্শা, তরবারি ও গাদা বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার করতেন। তাদের রণকৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও শত্রুর ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে পলায়ন। এ রণকৌশল ব্যবহার করে ফকির-সন্ন্যাসীরা কোম্পানির কুঠি লুঠ এবং অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে।

২.৪ বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির পদক্ষেপ

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোম্পানির সৈন্যদের সাথে মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। তবে কখনও তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবাহনা শাহ, মাদার বকস্ এবং করিম শাহ্ প্রমুখ ফকিরদের নেতৃত্ব দেন। এরা সবাই ছিলেন মজনু শাহের আত্মীয়। ১৭৮৭ সালে ইংরেজদের সাথে এক যুদ্ধে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠকও নিহত হন। তার মৃত্যুতে প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮০০ সাল নাগাদ বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

২.৫ বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও এর কারণ

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন বিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যর্থতার কতগুলো কারণ ছিল। যথা–

ক. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাব । মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল আন্দোলনকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলে।

খ. ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল ভ্রাম্যমাণ। স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল কম। তাছাড়া মুষ্টি সংগ্রহের জন্য অনেক সময় তারা স্থানীয় জনগণের উপর বল প্রয়োগ করতেন। তাই এ বিদ্রোহে তারা স্থানীয় জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়।

গ. কোম্পানির সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের উন্নত রণকৌশল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সামরিক প্রযুক্তির কাছে ফকির-সন্ন্যাসীদের পরাজয় ছিল অনিবার্য।

সার-সংক্ষেপ

বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের সনাতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তারা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পেছনে দেশপ্রেম বা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ-চিন্তা ছিল না। নানা প্রতিকূল কারণে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। বাংলার সমগ্র অঞ্চলে এ বিদ্রোহের প্রসার ঘটেনি। তবে এর ব্যাপ্তি ছিল উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন:

১. বাংলায় ফকির আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক ছিলেন—
   ক. তিতুমীর
   খ. মজনুশাহ বুরহানা
   গ. হাজী শরীফউল্লাহ
   ঘ. মীর এনায়েত আলী

২. সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন-
   ক. রাণী ভবানী
   খ. দেবী চৌধুরাণী
   গ. ভবাণী পাঠক
   গ. মঙ্গল পাণ্ডে

৩. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের চূড়ান্ত অবসান ঘটে—
   ক. ১৭৮২ সালে
   খ. ১৭৮০ সালে
   গ. ১৮০০ সালে
   ঘ. ১৭৯৩ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ফকিররা ছিলেন ____ সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত।
২. সন্ন্যাসীরা ছিলেন বেদান্তের ___ বিশ্বাসী।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ১৭৬০ সালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয়।
২. দেবী চৌধুরাণী ছিলেন সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কোন সময়ের মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?
২. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকারী গভর্নর জেনারেলের নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কারণ কি?
২. কি কি কারণে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল?

পাঠ-৩ : ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ☞ ফরায়েজি আন্দোলন কি, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ☞ ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

৩.১ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের ফলে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা বিনষ্ট হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। শিক্ষার অভাব ও কু-শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নানা অনাচার, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জাতির এ চরম দুর্দিনে মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে সব সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে 'ফরায়েজি আন্দোলন' অন্যতম। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরিয়ত উল্লাহ। তার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

৩.২ হাজী শরিয়ত উল্লাহর পরিচয়

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ১৭৮১ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শ্যামাইল গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। অল্প বয়সে বাবা-মায়ের মৃত্যুতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। ১৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং মওলানা বশরত আলীর সান্নিধ্য ও আশ্রয়ে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ফুরফুরায় যান এবং দুবছর সেখানে আরবি-ফারসি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে কিছুদিন চাচার কাছে অবস্থান করেন। ১৭৯৯ সালে উস্তাদ বাশারত আলীর সাথে তিনি মক্কা শরীফে যান এবং ১৮১৮ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সুদীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান কালে তিনি আরবি সাহিত্য এবং ইসলামী ধর্ম ও আইন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তিনি আরবের 'ওয়াহাবী আন্দোলনের' সংস্পর্শে আসেন এবং উক্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

৩.৩ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার আন্দোলন

বাংলার মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে তখন চরম অধঃপতনের কাল। মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসার পর বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনের প্রতি শরিয়ত উল্লাহর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম সমাজকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। এজন্য তিনি এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার এ আন্দোলন 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের গণমানসে এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

৩.৪ ফরায়েজি শব্দের অর্থ

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' শব্দ হতে উৎপন্ন। 'ফরজ' শব্দের অর্থ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ সময় বাংলার মুসলমান সমাজ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন এবং কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী বহুবিধ স্থানীয় লোকাচার ও পর্ব-উৎসব পালনে উৎসাহী ও অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের এসব পরিহার করে 'ফরজ' বা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কার্যকর করার এ আন্দোলন 'ফরায়েজি' আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

৩.৫ ফরায়েজি মতবাদ

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ইসলাম পরিপন্থী সব বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইসলামের ফরজ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনের জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান করেন। ইসলামের নফল বা অতিরিক্ত কর্তব্য পালনের জন্য ফরজ কাজগুলো যাতে ব্যাহত না হয় তিনি সে দিকে সতর্ক থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করাসহ ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি অনুসরণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরের প্রতি অতি শ্রদ্ধা, মাজারে কবর সেজদা ইত্যাদিকে 'শিরক' বা মহাপাপ বলে অভিহিত করেন। তিনি জন্ম, মৃত্যু ও

বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান, মিলাদ, ফাতেহা, ওরস এবং মহরমের মাতম ও তাজিয়া নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য এবং মুসলমানদের মধ্যে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণগত কুসংস্কার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' বা 'শত্রু রাষ্ট্র' ঘোষণা করেন এবং দুই ঈদ ও জুম্মার নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৩.৬ ফরায়েজি আন্দোলনের বিস্তার

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলন পূর্ব বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তারা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এ আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, আসাম ও ত্রিপুরা জেলায় প্রসার লাভ করে।

৩.৭ রক্ষণশীল মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের সাথে বিরোধ

মুসলমি সমাজে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে ফরায়েজিদের সাথে রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধ বাধে। অনেকেই শরিয়ত উল্লাহর বিরোধিতা এবং নানাভাবে তাকে বাধা দান করেন। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার রামনগরে ফরায়েজিদের সাথে রক্ষণশীলদের বিরোধ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত তা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় রূপ নেয়। হিন্দু জমিদার শ্রেণী এ সুযোগ গ্রহণ করে ফরায়েজিদের নির্মূলের চেষ্টা করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ছিলন তাদের স্বার্থের পথে প্রতিবন্ধক। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু জমিদার শ্রেণী এ সময় পূর্জা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। শরিয়ত উল্লাহ মুসলমানদের এসব অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য উপদেশ দেন। হিন্দু জমিদারদের গরু জবাই নিষিদ্ধ করাকে অমান্য করার জন্যও তিনি শিষ্যদের আহ্বান জানান। তিনি জমিদার জোতদার ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হবার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় বিক্ষুব্ধ হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজিদের বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে বহু মামলা-মকদ্দমা করেন। নীলকরদের সহায়তায় তারা ফরায়েজি আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় হাজী শরিয়ত উল্লাহ জীবনের অবশিষ্ট সময় বিরোধ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ফরায়েজি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া।

৩.৮ ফরায়েজি আন্দোলন ও দুদু মিয়া

দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম মুহসিন উদ্দিন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ ফরায়েজি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। দুদু মিয়া পিতার মতো সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফরায়েজি আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হতে জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রায়ত ও চাষীদের বলিষ্ঠ সংগ্রামে পরিণত করেন।

৩.৯ সাংগঠনিক তৎপরতা ও খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে দুদু মিয়া ফরায়েজিদের সংগঠিত করেন। যথা–

১. হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার হতে ফরায়েজি কৃষকদের রক্ষা করা। এজন্য তিনি একটি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। মোল্লা জালাল উদ্দিনকে এ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। ফরায়েজিদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃসংঘও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিপদে-আপদে তাদের সহযোগিতা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়।

২. দুদু মিয়ার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি সনাতনী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে সাম্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শালিসির মাধ্যমে সব ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে ফরায়েজি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরকারি কোর্ট-কাছারির মামলা-মকদ্দমা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়।

দুদু মিয়া ফরায়েজিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি খিলাফত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ফরায়েজি খিলাফত ব্যবস্থায় ওস্তাদ দুদু মিয়া ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদায়। তিনি তাঁর অধীনে উপরস্থ 'খলিফা' 'তত্ত্বাবধায়ক খলিফা' এবং 'গাঁও খলিফা' উপাধির তিন শ্রেণীর খলিফা নিয়োগ করেন। ফরায়েজি অধ্যুষিত এলাকার ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবারের একটি এলাকায় একজন 'গাঁও খলিফা' নিয়োগ করা হতো। দশ বা ততোধিক 'গাঁও খলিফা' শাসিত অঞ্চল নিয়ে একটি সার্কেল গঠন করা

হয়। সার্কেলের প্রধান ছিলেন 'তত্ত্বাবধায়ক খলিফা'। আর 'উপরস্থ খলিফা'গণ ছিলেন ওস্তাদ দুদু মিয়ার উপদেষ্টা এবং তাঁরা প্রধান কার্যালয় বাহাদুরপুরে ওস্তাদের সাথে অবস্থান করতেন। এভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুদু মিয়া ফরায়েজিদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ কার্যকর করেন।

৩.১০ জমিদার ও মহাজনদের সাথে সংঘর্ষ

দুদু মিয়া তাঁর পিতার নমনীয় ও মধ্যপন্থা ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে ফরায়েজি আদর্শ কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, জমির মালিক আল্লাহ। কাজেই কারো খাজনা আদায়ের অধিকার নেই। তিনি কৃষকদের জমিদার ও মহাজনদের দেয় সব ধরনের বৈধ ও অবৈধ কর প্রদানে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এতে দলে দলে কৃষক-প্রজা তার দলভুক্ত হয়। অন্যদিকে জমিদার ও মহাজন শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়। তারা দুদু মিয়ার আন্দোলন দমন করতে নীলকরদের সাথে হাত মেলায়। ফলে তাদের সাথে দুদু মিয়ার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কানাইপুরের জমিদার, ফরিদপুরের ঘোষ জমিদার এবং পাঁচচরের নীলকুঠির গোমস্তা কালিপ্রসাদের সাথে দুদু মিয়ার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য ফৌজদারি মামলা করা হয়। তাঁর অনুসারী শত শত লোককে কারাবরণ ও জুলুম সহ্য করতে হয়।

৩.১১ দুদু মিয়ার মৃত্যু

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে অন্তরীণ করে রাখে। দুবছর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ফরিদপুর পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। ১৮৬০ সালে তিনি মুক্তি পান। তবে দীর্ঘ কারাবরণ ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। ১৮৬২ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ফরায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

৩.১২ ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক চেতনা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রতকরণে এ আন্দোলন বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অন্যায় ও অনৈতিক কার্য পরিহার করে খাঁটি ইসলামী জীবন যাপন ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন বাংলার মুসলমান সমাজে প্রেরণা যোগায়।

সার-সংক্ষেপ

কোম্পানি শাসনামলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যে চরম অধঃপতন ঘটে, তার পটভূমিতে হাজী শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন শুরু হয়। সূচনাতে এটি ছিল একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসরণ ও অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণই ছিল আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তবে শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে এ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসময় এটি একটি সক্রিয় 'প্রজা আন্দোলনে' রূপ নেয়। অবশ্য দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং অন্যান্য কারণে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক—
   ক. মোঃ আবদুল ওয়াহাব   খ. সায়্যিদ আহমদ বেরলভী
   গ. তিতুমীর   ঘ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ

২. হাজী শরিয়ত উল্লাহর জন্মস্থান —
   ক. মাদারীপুর জেলায়   খ. ঢাকা জেলায়
   গ. রংপুর জেলায়   ঘ. ময়মনসিংহ জেলায়

৩. দুদু মিয়ার ফতোয়া অনুযায়ী জমির মালিক—
   ক. জমিদার   খ. ব্রিটিশ সরকার
   গ. আল্লাহ   ঘ. কৃষক নিজে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. শরিয়ত উল্লাহ ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে __________ বলে ঘোষণা করেন।
২. ________ সালে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. শরিয়ত উল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন।
২. মাওলানা বাশারত আলী ছিলেন দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ফরায়েজি আন্দোলন বাংলার কোন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল?
২. দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কি?
৩. দুদু মিয়ার মতে জমির প্রকৃত মালিক কে?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কি বুঝায়?
২. হাজী শরিয়ত উল্লাহ্র সময় ফরায়েজি আন্দোলনের স্বরূপ কি ছিল?
৩. দুদু মিয়া কিভাবে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন?

পাঠ-৪ : তিতুমীরের আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ এ আন্দোলনের প্রকৃতি বা চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
☞ আন্দোলনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

৪.১ তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন

পূর্ব বাংলায় যখন ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, প্রায় একই সময় পশ্চিম বাংলায়ও আরেকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নাম 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া'। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। ১৮২৭ সালে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৮৩১ সালে তিতুমীরের শাহাদাৎ বরণের মধ্যদিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪.২ তিতুমীরের পরিচয়

তিতুমীরের প্রকৃত নাম সায়্যিদ মীর নিসার আলী। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুরের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৭৮২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলী। বাল্যকালে হাদিস তথা ইসলামী ধর্ম শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, দর্শন, তাসাউফ ও মানবিক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রামের ব্যায়ামাগারে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কুস্তিগীর হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লাঠি খেলা এবং তরবারি চালনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিতুমীর ১৮২২ সালে হজ পালনের জন্য মক্কা শরীফ যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত ইসলামী ধর্ম সংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর কাছে দীক্ষা নেন। সায়্যিদ আহমদের নির্দেশে তিতুমীর ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং হায়দরপুরে বসতি স্থাপন করে 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।

৪.৩ তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য

তিতুমীরের আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে। পরে এটি প্রজা আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দুটি। যথা–

ক. মুসলিম সমাজ হতে শিরক ও বেদাতসহ প্রচলিত কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতি নির্মূল করা
খ. বাংলার মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

অবশ্য পরবর্তীতে বাংলার প্রজাকুলের ওপর স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে বাংলাকে মুক্ত করা এ আন্দোলনের লক্ষে পরিণত হয়।

৪.৪ তিতুমীরের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

এ সময় বাংলার মুসলিম সমাজ নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুসরণ করত। এমতাবস্থায় তিতুমীর বাংলার মুসলমানদের যে সব নিয়ম-নীতি মেনে চলার নির্দেশ দেন তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো–

ক. একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মান্য করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।
খ. কোন পীরের কাছে মাথা নত না করা, মাজার তৈরি এবং তাতে কোন কিছু মানত না করা।
গ. স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি-প্রথা, অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করা এবং
ঘ. ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, কিয়াম ও মহররম উদযাপন ইত্যাদি বেদাতী কার্যকলাপ পরিহার করা।

তিনি মুসলমানদের কাছা বা গোছ খুলে তহবন্দের মতো ধুতি পরতে এবং ইসলামের সুন্নত মোতাবেক দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেন। এভাবে তিতুমীর মুসলমানদের বিজাতীয় প্রভাব, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির কবল থেকে মুক্ত করে ইসলাম ধর্মের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলা থেকে তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমে তা অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশ মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

৪.৫ জমিদার ও ইংরেজদের সাথে সংঘাত

প্রথমে তিতুমীরের আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় এতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। এসময় রক্ষণশীল মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর অল্প-স্বল্প বিরোধ হয়। তবে চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার বহু কৃষক ও তাঁতী তিতুমীরের আন্দোলনে যোগ দিলে তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ আতঙ্কিত বোধ করেন। তারা তিতুমীরের অনুসারী প্রজাদের অযথা হয়রানি ও উৎপীড়ন শুরু করেন। মুসলমান রায়তদের উপর আড়াই টাকা হারে 'দাড়ি ট্যাক্স' আরোপ করা হয়। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও রাণাঘাট এলাকার সাতজন বড় বড় জমিদার একজোট হয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতা, মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু ধর্ম ও এর অনুসারীদের ক্ষতি সাধন ইত্যাদি অভিযোগ এনে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। ফলে তিতুমীরের সাথে এসব জমিদারদের সংঘর্ষ বাধে। এ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা এবং কৃষকদের নিরাপত্তা দানের জন্য তিতুমীর একটি 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠন করেন। তাঁর শিষ্য ও ভাগ্নে গোলাম মাসুমকে এ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। তিতুমীরের তৎপরতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে গোবরাডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার রাজ নারায়ণ, নাগপুরের গৌরী প্রসাদ চৌধুরী সম্মিলিত জোট তৈরি করেন। তাঁরা তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। গোবরাডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির ইংরেজ কুঠিয়াল ডেভিস তিতুমীরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তিতুমীরের বাহিনী নীলকুঠি আক্রমণ করে তা লুণ্ঠন এবং কুঠি প্রধানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তিতুমীরের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লাউঘাটার জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। এমতাবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত জমিদার ও নীলকরগণ তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান।

৪.৬ তিতুমীরের বাশের কেল্লা

তিতুমীর ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে পাঁচ সহস্র মুজাহিদ মোতায়েন করা হয়। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিতুমীর নিজেকে 'বাদশাহ' ঘোষণা করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফকিরপুর জেলায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি তিনি তাকি ও গোবরাডাঙ্গার জমিদারদের নিকট কর দাবি করলে তারা ইংরেজদের শরণাপন্ন হন।

৪.৭ ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে তিতুমীরের মৃত্যু

জমিদারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ইংরেজ সরকার তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের অনুসারীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮৩১ সালের ১৭ নভেম্বর মেজর স্কটের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সাহসের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তাঁর বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। ৫০ জন অনুসারীসহ তিতুমীর নিজে যুদ্ধে শহীদ হন। মুজাহিদ বাহিনী প্রধান গোলাম মাসুম সহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

৪.৮ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি

মুখ্যত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে এবং আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল। তিতুমীরের শাহাদাৎবরণ এবং গোলাম মাসুমের ফাঁসির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির অনুসরণে আচ্ছন্ন তখন পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীর 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার হলেও পরবর্তীতে এটি একটি প্রজা আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কারণে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সাথে হিন্দু জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের সশস্ত্র সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা পরাস্ত হন এবং আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। তার এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। এখানেই এ আন্দোলনের বড় গুরুত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম—
   ক. জেহাদ আন্দোলন   খ. ফরায়েজি আন্দোলন
   গ. ওয়াহাবী আন্দোলন   ঘ. তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন

২. তিতুমীরের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—
   ক. ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার   খ. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ
   গ. অর্থনৈতিক সংস্কার   ঘ. জনকল্যাণ সাধন

৩. তিতুমীর শাহাদাৎবরণ করেন—
   ক. ১৮৩০ সালে   খ. ১৮৩১ সালে
   গ. ১৮৩২ সালে   ঘ. ১৮৩৩ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুণ

১. তিতুমীর পশ্চিম বঙ্গের ____ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
২. ১৮৩১ সালে তিতুমীর ____ একটি দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. মক্কায় তিতুমীর সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর নিকট দীক্ষা নেন।
২. তিতুমীর মুসলমানদের পীর প্রথা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. তিতুমীরের পিতার নাম কি?
২. মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন?
৩. তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণকারী বড়লাটের নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. সংক্ষেপে জমিদার ও ইংরেজদের সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ দিন।

পাঠ-৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানি শাসনের অবসান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এই সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক যুগান্তকারী ঘটনা। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। ফলে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

৫.১ স্বরূপ ও প্রকৃতি

১৮৫৭ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও সমকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের মতে, এটি ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকও এ মত পোষণ করেন। কেননা তাদের মতে, এর পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়নি। কোন কোন ব্রিটিশ এবং বিশেষ করে অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকদের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ শাসন অবসানকল্পে ভারতীয়দের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বা 'স্বাধীনতা লড়াই'। এ লড়াই শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্যাপক গণমানুষ এর প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে।

৫.২ স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ

১৮৫৭ সালের সংগ্রামের নানাবিধ কারণ ছিল। এসব কারণকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পরোক্ষ কারণসমূহের মধ্যে ছিল- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক অসন্তোষ। নিম্নে ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

ক. রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর কয়েকটি হিন্দু ও মুসলিম রাজ্য দখল, নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করা, মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে অপমান, মোগল সম্রাটের উপাধি হরণ ইত্যাদি হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজ্যচ্যুত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

খ. অর্থনৈতিক কারণ

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির ভারত থেকে সোনা, রূপাসহ নগদ অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচারের ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি, সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকরি আইনের ফলে বহু লোক বেকার কর্মহীন ও আর্থিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অবাধে ব্রিটিশ পণ্য আমদানির ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে পড়ে। বৈষম্যমূলক শুল্ক ও কর আরোপের ফলে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকীর সম্মুখীন হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। ভারতীয়দের এরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয় কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

গ. সামাজিক কারণ

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের উন্নাসিক মনোভাব, অনৈতিক আচার-আচরণ উভয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। সে কারণে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন, শিশু হত্যা নিবারণ, নারী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার ভারতীয়দের ব্রিটিশদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়।

ঘ. ধর্মীয় কারণ

ভারতীয়দের ধর্ম সম্পর্কে খ্রিস্টান মিশনারীদের অশালীন মন্তব্য, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, ব্যারাকের সিপাহী এবং জেলখানার কয়েদিসহ সর্বত্র খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ তৎপরতা, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন ধর্মভীরু ভারতীয়দের বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

ঙ. সামরিক কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সামরিক অসন্তোষ। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সিপাহীরা ছিল সংখ্যাগুরু। কিন্তু বেতন-ভাতা ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশদের তুলনায় ছিল সুবিধা বঞ্চিত। তদুপরি ব্রিটিশ অফিসারদের উদ্ধত, অশালীন ও অপমানজনক আচরণ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করে। ভারতীয় সৈন্যদের কপালে তিলক লেপন, দাড়ি রাখা এবং পাগড়ি পরা নিষিদ্ধকরণ এবং সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্যকরণের ফলে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও মারাত্মক আঘাত হানে। তারা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

চ. প্রত্যক্ষ কারণ

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত তখন চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ প্রবর্তনের ঘটনা বারুদে অগ্নী স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। ১৮৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে 'এনফিল্ড রাইফেল' প্রচলন করা হয়। এতে ব্যবহৃত কার্তুজ দাঁতে কেটে ভরতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মেশানো আছে। এটি ধর্মনাশের একটি পরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে দারুন বিক্ষোভের সূচনা করে। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নী জ্বলে ওঠে।

৫.৩ বিদ্রোহের ঘটনা

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে 'মঙ্গল পান্ডে' নামক একজন সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। ক্রমে এ বিদ্রোহ মিরাট, দিল্লি, বেরলী, ফতেহপুর, কানপুর, বুন্দেল খণ্ড, রোহিলা খণ্ড, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কলকাতা, বিহার, চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর এবং দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহকে ভারতের বাদশাহ ও বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করে। মারাঠা নেতা নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণি লক্ষীবাঈ, মৌলভী লিয়াকত আলী, মৌলভী আহম্মদ উল্লাহ প্রমুখ বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সিপাহীরা জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদিদের মুক্তি, খাজাঞ্চিখানা লুঠ এবং সর্বত্র ব্রিটিশদের আক্রমণ করে। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম প্রথমত সিপাহী বিদ্রোহ রূপে শুরু হলেও পরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় বেসামরিক জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতির কারণে তা গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

৫.৪ ইংরেজদের সংগ্রাম দমন

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহী ও জনতার ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম দমনের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হেনরী লরেন্স, হিভলক, কালন ক্যাম্পবেল প্রমুখ সেনাপতিদের সাহায্যে অত্যন্ত কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করা হয়। পরাজিত বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতা মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। মারাঠা নেতা নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ঝাঁসির রাণি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহীদের অনেককে কারাদণ্ড এবং অনেক ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫.৫ ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ

ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এটি সফল হয়নি। এর ব্যর্থতার কারণগুলো ছিল :

১. সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব;
২. দক্ষ, সুযোগ্য এবং একক নেতৃত্বের অভাব;
৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা;
৪. সিপাহীদের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় রসদের অভাব;
৫. ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল ও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার;

৬. ব্রিটিশদের ডাক ও তার ব্যবস্থাসহ উন্নত যোগাযোগ সুবিধা;
৭. ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি, জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণী, ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শিখ ও গুর্খা বাহিনী এবং কিছু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধার ইংরেজদের সহযোগিতা দান, এবং
৮. সর্বোপরি প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সিপাহীদের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ইত্যাদি।

৫.৬ ফলাফল বা প্রভাব

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও এর ফলাফল ছিল তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী। যথা–

১. এর ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের গভর্নর জেনারেলের উপাধি হয় 'ভাইসরয়'।
২. এর ফলে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এক রাজকীয় ঘোষণায় মহারাণি ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার, স্বত্ব বিলোপনীতি বাতিল এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের আশ্বাস দেন।
৩. ভবিষ্যতে সেনা বিদ্রোহ রোধের জন্য সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং সেনাবাহিনীতে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়।
৪. মোগল সম্রাটের আইনগত অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়।
৫. বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয় এবং
৬. এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে দেশত্ববোধ ও জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়।

সার-সংক্ষেপ

ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতি ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল এ অসন্তোষ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নানাবিধ কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল–
ক. সামাজিক অসন্তোষ
খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বাতিল
গ. খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার
ঘ. এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন

২. সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মোগল সম্রাট–
ক. দ্বিতীয় আলমগীর
খ. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
গ. দ্বিতীয় শাহ্ আলম
ঘ. বখ্ত খান

৩. ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজের হাতে অর্পিত হয়–
ক. ১৮৫৭ সালে
খ. ১৮৬০ সালে
গ. ১৮৫৮ সালে
ঘ. ১৮৬২ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৮৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে _____ রাইফেল প্রবর্তন করা হয়।
২. ১৮৫৮ সালে _____ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গলপান্ডে নামক একজন সিপাহী প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।
২. সম্রাট বাহাদুর শাহকে নেপালে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ কি?
২. কোন আইনানুসারে ভারতে ব্রিটিশ রাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।
২. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ আলোচনা করুন।
৩. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেন ব্যর্থ হয়েছিল।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১০

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি? এর ফলাফল আলোচনা করুন।
২. বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের একটি বিবরণ দিন।
৩. ফরায়েজি আন্দোলন কি? ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্র ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৪. ফরায়েজি আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে দুদু মিয়ার কর্মকাণ্ড আলোচনা করুন।
৫. উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক তিতুমীরের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৬. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।